ইউনিট ৪

উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি, সুযোগ-সুবিধার সমতা, উৎকর্ষ ও দক্ষতা

[Access to Higher Education : Question of Equity, Efficiency and Excellence]

ভূমিকা

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা ডিগ্রী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দেওয়া হয়। ডিগ্রী কলেজ দুই ধরনের, সরকারি ও বেসরকারি; ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একই ধারার ছিল সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চ শিক্ষার সামাজিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ সালে প্রণয়নের পর বেশ সংখ্যক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে উভয় ধারার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের কোর্সে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়। কোর্সগুলো হলো: দুই বছরের স্নাতক, তিন/চার বছরের স্নাতক সম্মান; দুই বছরের স্নাতকোত্তর মাস্টার্স, এক বছরের স্নাতকোত্তর মাস্টার্স; দুই বছরের এম ফিল; কমপক্ষে তিন বছরের পি এইচ ডি।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত স্নাতক সম্মান কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থী ভর্তি করে। প্রতিষ্ঠানের সীমিত আসন বা সুযোগের জন্য অনেক প্রার্থীই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আবার দেশের চাহিদা ও সমকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কোর্স শিক্ষাদানের সুযোগও কম। বর্তমানে যে সুযোগ আছে তাতে অল্প সংখ্যক প্রার্থী ভর্তি হতে পারে।

উচ্চ শিক্ষা থেকে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করার জন্য তিনটি উপাদান অপরিহার্য: সমতা (equity), উৎকর্ষতা (excellence) এবং দক্ষতা (efficiency)। আমাদের বর্তমান উচ্চ শিক্ষায় এই অপরিহার্য দিকগুলো কতদূর প্রতিফলিত হয়েছে তা পর্যালোচনা প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষায় সমতা, উৎকর্ষতা ও দক্ষতার সমকালীন অবস্থার চিত্র থেকে এই স্তরের শিক্ষার পুনর্বিন্যাসের দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে। নিচের পাঠগুলো এই ইউনিটে উপস্থাপনা করা হয়েছে:

পাঠ - ৪.১ উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি ও সুযোগ সুবিধা

পাঠ - ৪.২ উচ্চ শিক্ষায় ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা ও সুযোগ সুবিধার সমতা বিধান

পাঠ - ৪.৩ উচ্চ শিক্ষার উৎকর্ষ ও দক্ষতার সমকালীন অবস্থা

পাঠ - ৪.৪ উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়ন উৎকর্ষ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত নীতি ও কর্মপন্থা

পাঠ ৪.১ উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি ও সুযোগ সুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও সুযোগ সুবিধার বর্তমান অবস্থা বলতে পারবেন;
- ❑ কলেজে ভর্তি ও সুযোগ সুবিধার প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য উপস্থাপন করতে পারবেন এবং
- ❑ উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণের ও সুযোগ সুবিধার প্রধান অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

ভর্তি পরীক্ষার চিত্র

বাংলাদেশে বর্তমানে ১১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এইচ এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে প্রার্থীরা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। অবশ্য ভর্তির জন্য প্রার্থীদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চিত্র থেকে দেখা যায় যে একজন প্রার্থী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ইউনিটে গড়ে ৩/৪ টি ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলিয়ে ১৫/১৬ টি পরীক্ষা দিচ্ছে। এসব পরীক্ষায় ভর্তি হওয়ার নিশ্চয়তার অভাবে ডিগ্রী কলেজেও ভর্তি হয়। এর ফলে সম্পদ ও সময়ের অপচয় হচ্ছে; ভর্তি পদ্ধতি জটিল হচ্ছে এবং অনুন্নত ও অসচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অপরদিকে ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এইচ এস সি পরীক্ষা শেষ হতে না হতে কোচিং শুরু হয়। শহরে বসবাসকারী ও সচ্ছল পরিবারের সন্তানেরাই প্রধানত উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির কোচিং ব্যবস্থা থেকে লাভবান হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর জীবনে ও অভিভাককের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ডিগ্রী অর্জনের জন্য অধ্যয়ন কালে শিক্ষার্থী ভবিষ্যতের দক্ষ মানব শক্তি হিসাবে তৈরির সুযোগ লাভ করে। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আলাদাভাবে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষার্থীর এস এস সি, এইচ এস সি পরীক্ষার ফলাফল, ভর্তি পরীক্ষার কৃতিত্ব সব মিলিয়ে মেধা তালিকার প্রথমে তার অবস্থান থাকলে সে তার নিজের প্রথম পছন্দের বিষয়ে ভর্তি হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির তথ্য থেকে দেখা যায় যে ৫০% নিচে শিক্ষার্থী তাদের প্রথম পছন্দের বিষয় ভর্তি হতে পেরেছে। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পছন্দের বিষয়ে ভর্তি হয়। অনেক ক্ষেত্রে নির্দেশনা কমিটির পরামর্শ অনুসারে শিক্ষার্থী তার পছন্দের বাইরের বিষয়েও ভর্তি হয়। পুনরায় দেখা যায় শিক্ষার্থী তার প্রথম পছন্দের বা দ্বিতীয় পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারেনা। বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন বা বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথম ডিগ্রীর পর্যায়ে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর ভর্তির চিত্র আশাব্যঞ্জক নয়।

ভর্তির সুযোগ

প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষা ও দু'টি পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের প্রবেশ বা ভর্তি নির্ধারণ করে। মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাই ভাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পায় এবং কর্মজগতে যেসব বিষয়ের উচ্চ চাহিদা আছে সেগুলোতেও ভর্তি হতে পারে। ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের আসন ও আবেদনপত্রের সংখ্যা থেকে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি বা প্রবেশের চাপ অনুধাবন করা যায়। সারণি-৪ দ্রষ্টব্য।

সারণি-৪: উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন ও আবেদনপত্রের সংখ্যা

প্রতিষ্ঠান	আসন সংখ্যা	আবেদনপত্রের সংখ্যা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩৭৩০	৬৩,৩১৩
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৩২০০	৫৬,৩০০
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়		
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	৬০০	৪৩,৪১৭
বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়	৫৮৫	৬২১৭
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৫৭০	১০,০১৮
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	৭২০	১৪,২৮৫
মেডিক্যাল কলেজ	১৪৫০	২০,০০০

উৎস: Visons and Rivisions, p 68 (সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত)

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছয়টি থেকে ১১টিতে উন্নীত হয়েছে, ১৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে; আরো কয়টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। সারণি-৫ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থী, ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত সংশ্লিষ্ট তথ্য চিত্র পাওয়া যায়।

সারণি-৫: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক সংখ্যা, ১৯৯৭

তথ্য	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	মোট
প্রতিষ্ঠানের সংখ্য	১১	১৬	২৭
শিক্ষার্থী সংখ্যা (হাজারে)	৬৭.৮	৬.২	৭৪.০
ছাত্রী সংখ্যা (%)	২৪.২	১৬.৮	২৩.৬
শিক্ষক সংখ্যা (হাজারে)	৪.০	০.৬	৪.৬
মহিলা শিক্ষক (%)	১৫.৩	১৩.৫	১৫.০
শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত	১ঃ১৭	১ঃ১৩.৩	১ঃ১৬

উৎস: ব্যানবেইস, ১৯৯৮ এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ১৯৯৮

উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নের সুযোগ সীমিত। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ১৯৯৬ সালে ২৪২,০০০ জন শিক্ষার্থী এইচ এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। এদের মধ্যে ১০% এর কম সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়। অবশিষ্ট বিরাট সংখ্যক ডিগ্রী কলেজ, টেকনিক্যাল ইনিস্টিটিউটে প্রবেশ করে। কিছুসংখ্যক কর্মে যোগ দেয়।

অধ্যয়নের ক্ষেত্র হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৯৭ সালে ভর্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৬২% কলা, মানবিক বিষয়, সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হয়েছে। (সারণি ৬ দ্রষ্টব্য)

সারণি-৬: অধ্যয়নের ক্ষেত্র হিসাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা, ১৯৯৭

অধ্যয়নের ক্ষেত্র	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা (%)
কলা ও মানবিক বিষয়	১৪,৪০০	২১.৫
সামাজিক বিজ্ঞান	১৪,০০০	২০.৯
বিজ্ঞান	১৪,১০০	২১.১
বাণিজ্য	৮,৩০০	১২.৪
আইন	৩,০০০	৪.৫
কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়	৩,৫০০	৫.২
প্রকৌশল	২,৯০০	৪.৩
মাস্টার্স/পিইচডি	২,৪০০	৩.৬
অন্যান্য	৪,৩০০	৬.৫
মোট	৬৬,৯০০	১০০.০০

উৎস: ব্যানবেইস, ১৯৯৮, সেকশন ৪, সারণী-৫

বাণিজ্য, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, আইন ও প্রকৌশল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও দেশের উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৮% এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। তেরটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় অবস্থিত।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যারা নানা কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় না উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কর্মজীবনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নানা প্রকারের সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী কোর্সে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে স্বল্প ব্যয়ে নমনীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলো পরিচালনা করা হয়। ব্যবসা প্রশাসন ও শিক্ষক শিক্ষণে মাস্টার্স কার্যসূচিও চালু করা হয়েছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রবর্তনের প্রস্তুতি চলছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সে প্রায় ১৫,০০০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে।

কলেজে ভর্তি

ডিগ্রী কলেজগুলোতে স্নাতক পাস, স্নাতক অনার্স ও মাষ্টার্স কার্যক্রম আছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিয়ে কলেজগুলো বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয়ের কোর্স পরিচালনা করে। এইচ এস সি উত্তীর্ণদের মধ্যে অল্পসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির সুযোগ পায়। অবশিষ্টের বৃহৎ অংশ ৮৫% ডিগ্রী কলেজে ভর্তি হয়। ভর্তির ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয়তার জন্য বেসরকারি কলেজে ভর্তির হার সরকারি কলেজের চেয়ে বেশি (সারণি-৭ দ্রষ্টব্য)। মোট শিক্ষার্থীর এক তৃতীয়াংশ ছাত্রী।

সারণি-৭: ডিগ্রী কলেজের বিভিন্ন পর্যায়ের কোর্সে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, ১৯৯৮

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা (হাজারে)				ছাত্রীর হার %
		স্নাতক পাস	স্নাতক অনার্স	মাষ্টার্স	মোট	
সরকারি	২২৫	১১০.৯	৬০.০	৩০.১	২০১.০	৩৪.৩
বেসরকারি	৫৪৩	২১৯.৬	৪.০	১.৮	২২৫.৪	৩১.৬
মোট	৭৬৮	৩৩০.৫	৬৪.০	৩১.৯	৪২৬.৪	৩৩.১

উৎস: ব্যানবেইস, ১৯৯৮, সেকশন ২, সারণি-৭

শিক্ষক, শিক্ষার্থীর অনুপাত সরকারি ও বেসরকারি কলেজে যথাক্রমে ১.৫৪.৮ এবং ১.৩২.৮। অনুপাতের হার থেকে বুঝা যায় যে সরকারি কলেজের উপর শিক্ষার্থীর চাপ বেশি।

ডিগ্রী কলেজে সাধারণত স্নাতক কোর্সে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। কিছুসংখ্যক কলেজে নির্বাচনী ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে স্নাতক সম্মান কোর্সে ভর্তির জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের নীতি প্রবর্তন করেছে।

উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণ

উচ্চশিক্ষা গ্রহণ উপযোগী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক নয়। পুরুষদের মধ্যে জনগোষ্ঠীর ৫.৪ শতাংশ এবং মেয়েদের মধ্যে ১.১ শতাংশ (৯০ দশকের প্রথম দিকে) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছিল। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর এক চতুর্থাংশ ছাত্রী; বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তির হার শতকরা ১৭ ভাগ। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিজ্ঞান ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার আরো কম, শতকরা ৪ ভাগ। কলেজগুলোতে মেয়েদের অংশগ্রহণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশি; মোট শিক্ষার্থীর ৩৩.১% ভাগ ছাত্রী। অপরদিকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তির হার আশাব্যঞ্জক, মোট শিক্ষার্থীর ৬০ থেকে ৭০ ভাগ ছাত্রী।

জনগোষ্ঠীর তুলনায় উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার হতাশাব্যঞ্জক। মাধ্যমিক স্তরের বয়স উপযোগী শিক্ষার্থীর শিক্ষায় অংশগ্রহণের নিম্হার, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য সীমিত সুযোগ, পৌর এলাকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান, গ্রাম ও শহর অঞ্চলের বৈষম্য, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা প্রভৃতি কারণে উচ্চ শিক্ষার প্রসারে বাধা সৃষ্টি করছে এবং শিক্ষার সুযোগ সুবিধার সমতা বিধানে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও পুনর্বিন্যাস এর মাধ্যমে এসব অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা দূর করে উচ্চ শিক্ষার প্রসারের জন্য সুযোগ সৃষ্টি বাঞ্ছনীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. বিশবিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য একটি ছেলে বা একটি মেয়ে সব মিলিয়ে গড়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কয়টি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে?
   ক. ১৫/১৬ টি
   খ. ৩/৪ টি
   গ. ৭/৮ টি
   ঘ. ১১/১২ টি

২. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কোন নীতির ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়?
   ক. সাক্ষাৎকার
   খ. মেধা স্কোর
   গ. পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল
   ঘ. কোটা পদ্ধতি

৩. মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ কোথায় বেশি?
   ক. ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে
   খ. কর্ম জীবনের উচ্চ চাহিদা আছে এমন বিষয়ে
   গ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
   ঘ. ক ও খ উত্তর শুদ্ধ

৪. ১৯৯৭ সালের তথ্য অনুসারে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা কত ছিল?
   ক. প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ
   খ. প্রায় শতকরা ৩৩ ভাগ
   গ. প্রায় শতকরা ২৪ ভাগ
   ঘ. প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ

৫. এইচ এস সি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের কত অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়?
   ক. শতকরা ১৫ ভাগ
   খ. শতকরা ৮০ ভাগ
   গ. শতকরা ১০ ভাগ
   ঘ. শতকরা ২০ ভাগ

৬. সবচেয়ে কম সংখ্যক শিক্ষার্থী কোন কোন বিষয়ে ভর্তি হয়?
   ক. কলা, আইন ও কৃষি
   খ. আইন, কৃষি ও প্রকৌশল
   গ. সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল
   ঘ. বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও আইন

৭. কোন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী ভর্তির হার সর্বনিম্ন?
   ক. প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
   খ. সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়
   গ. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
   ঘ. ডিগ্রী কলেজে

৮. উচ্চ শিক্ষা প্রসারের বাধা কোনটি?
   ক. উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সীমিত সুযোগ
   খ. শহরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠানের অবস্থান
   গ. অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা
   ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চিত্র সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। গ ৫। গ ৬। খ ৭। ক ৮। ঘ।

পাঠ ৪.২ উচ্চ শিক্ষায় ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও সুযোগ সুবিধার সমতা বিধানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন এবং
- ❑ উচ্চ শিক্ষার কোন কোন ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও সুযোগ সুবিধার সমতা বিধানে বৈষম্য দেখা যায় তা চিহ্নিত করতে পারবেন এবং তা দূরীকরণের উপায় বলতে পারবেন।

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

একটি গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল সমাজ গঠন করতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে সুযোগ সুবিধার সমতা বিধান অপরিহার্য। সামাজিক বৈষম্যের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার শ্রেণী বৈষম্যের উদ্ভব হয়েছে। তবে, উপযুক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এরূপ বৈষম্য দূরীকরণের প্রধান ও নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ লাভের অধিকার বিশ্বজনীন নীতি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিসংঘ ও তার সাথে সংযুক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের এ একটি মূলনীতি। জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদে ঘোষিত নীতিমালায় তা সন্নিবেশিত হয়েছে। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) বলেছেন,

> ''এ মানবাধিকার নীতিটি সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি হিসাবে নতুন সমাজ গঠন কল্পে এর রূপায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সংবিধানে এই নীতি সন্নিবেশিত হয়েছে এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ বহুবিধ সরকারি ঘোষণাপত্রে এর রূপায়নের কথা উল্লিখিত হয়েছে।''

কমিশন এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন,

> ব্যক্তিত্ব, সমাজের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য শিক্ষা লাভের সুযোগ সুবিধার সমতা বিধান একটি অপরিহার্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নীতি এবং প্রধানত এ নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত এবং নানাবিধ শ্রেণী বৈষম্যও বিদূরিত হতে পারে। অন্যকথায় বলা যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাপনা যেমন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম সহায়ক ও পরিপূরক তেমনি রাষ্ট্র শিক্ষাকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করে সামাজিক বৈষম্য দূর করতে সক্ষম।

শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নীতির সহায়ক হিসাবে অনেক কিছু করণীয় আছে। এ ব্যাপারে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালিত হবে প্রধানত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং এরূপ সুযোগ লাভ সামাজিক ও নাগরিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত হবে। ছাত্রছাত্রীর প্রবণতা, বুদ্ধিমত্তা ও মেধা ব্যতীত অন্য কোন কিছুই সুযোগ-সুবিধার তারতম্যের ব্যাপারে বিবেচ্য হওয়া উচিত নয়। যথাসম্ভব একই ধরনের শিক্ষাঙ্গনে কিংবা সমান সুবিধাপূর্ণ শিক্ষায়তনে সকল শিক্ষার্থীর মান উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক মান উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সুতরাং সর্বস্তরের এবং একই ধরনের সকল শিক্ষায়তনের সর্বত্র ন্যায় ও সমতার

ভিত্তিতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সহায়তা, পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ লাভ করবে। শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিক নিজেকে উন্নত করার ব্যক্তিগত প্রবণতা একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হিসাবে স্বীকৃতি পাবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থা এর ধারক হিসাবে নিয়োজিত থাকবে। উচ্চতর শিক্ষার স্তরে বা বিশেষ পেশাগত শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রবণতা, প্রতিভা এবং মানসিক ও শারীরিক অবস্থা বিবেচ্য বিষয় হবে। সর্বোপরি শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টিকারক পরিবেশগত ও মনস্তাত্ত্বিক কারণসমূহ নিরসনের জন্য দৃঢ় ও সচেতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর প্রায় ২৬ বছর অতিক্রম হয়েছে তবুও শিক্ষায় বিশেষ করে উচ্চস্তরের শিক্ষায় ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধানের দাবী এখনো সোচ্ছার।

বৈষম্য

উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণে বৈষম্য রয়েছে। শিক্ষার ব্যয়ভার যারা বহন করতে পারে তারাই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে, উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে। পেশাজীবী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী সরকারি চাকুরে - তাদের সন্তানেরা প্রধানত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে। দরিদ্র ও আর্থ-সামাজিক সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত পরিবারের সন্তানেরা আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে ভর্তি হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কোন শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হওয়ার চেয়ে ৫৮ গুণ বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পূর্বে যারা অধ্যয়ন করে এইচ এস সি পাশ করেছে তারা শিক্ষায় জাতীয় পুঁজি বিনিয়োগের বেশ কিছু সুযোগ ভোগ করেছে এবং উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের পরও তারা সেই পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ গ্রহণ করছে। এই প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের একটি গবেষণা প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে,

> "The financing arrangements in the education system and the structure of enrolments result in highly inequitable distribution of public spending on education, with the 10 percent best educated people in a generation receiving as much as 76 percent of the cumalative public spending appropriated to the entire generation through publicly financed education".

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষায় এই ব্যয় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের ব্যয়ের দ্বিগুণ।

বিভিন্ন পর্যায় ও ধারার শিক্ষার মাথাপিছু সরকারি ব্যয় থেকে শিক্ষায় পুঁজি বিনিয়োগের বৈষম্য অনুধাবন করা যায় (সারণি-৭ দ্রষ্টব্য)। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র প্রতি ব্যয় ৫৮৬ টাকা এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ব্যয়ের হার যথাক্রমে ২৫.৪৮% ও ৬৪.৪৮% বেশি।

সারণি-৭: বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ের শিক্ষায় ছাত্র প্রতি সরকারি ব্যয়

প্রতিষ্ঠান	মাথাপিছু ব্যয় (টাকায়)
প্রাথমিক স্কুল	৫৮৬
মাধ্যমিক স্কুল	৩৩৫৬
মাদ্রাসা	৬২৫৪
কলেজ	১৪,৯৩৩
ক্যাডেট কলেজ	৫৬,৫৩৭
বিশ্ববিদ্যালয়	৩৭,২০১

উৎস: BANBEIS, Bangladesh Educational Statistics, 2000

দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষার এই উচ্চ সরকারি ব্যয়ের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। কারণ এরা শিক্ষার নিম্ন পর্যায় থেকে ঝরে পড়ে।

উচ্চ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে মেয়েরা অনেক পিছিয়ে আছে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী পুরুষ জনসংখ্যার ৫.৪% ছাত্র এবং মহিলা জনসংখ্যার ১.১% ছাত্রী নব্বই দশকের প্রথম দিকে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছিল। ১৯৯৯ সালের তথ্যে দেখা যায় ডিগ্রী কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৬% ও ২০% ভাগ। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭% ছাত্রী। পেশাগত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছাত্রীসংখ্যা অনেক কম। তবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সে ছাত্রী অংশগ্রহণের হার অনেক বেশি; ৬০% থেকে ৭০% ছাত্রী এসব কোর্সে অধ্যয়ন করে।

আরো লক্ষ্যণীয় উচ্চ শিক্ষার বাজেটের ১০% ছাত্রছাত্রীর আর্থিক সাহায্য ও স্টাইপেন্ড দেওয়ার জন্য বরাদ্দ করা হয়; মেধা অনুসারে শিক্ষার্থীরা এই আর্থিক সাহায্য ও স্টাইপেন্ড ভোগ করে; অসচ্ছলতার জন্য নয়।

উলে- খ্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শহরে অবস্থিত। এ কারণে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে শহর ও গ্রাম অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। বাংলাদেশের ৮০% লোক গ্রামে বসবাস করলেও গ্রামের ছেলেমেয়েদের খুব কমসংখ্যক উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণ করছে; মাত্র ২০% ভাগ। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও গ্রাম অঞ্চলের অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী পড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

সমতা বিধান ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উপায়

উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার একটা অর্থপূর্ণ সমতা বিধান করা বাংলাদেশের জন্য বর্তমান সময়ে একান্ত জরুরী। শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আশানুরূপ ফল পেতে হলে সকল স্তরের মানুষের শিক্ষার অধিকার আইনগত ও কাঠামোগতভাবে, চিন্তাধারার ও মননে গ্রহণ করতে হবে। সমাজে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে শিক্ষার সর্বস্তরে, উচ্চ শিক্ষার ও সকল মানুষের (১) শিক্ষা গ্রহণের সমান অধিকার; (২) শিক্ষার সুযোগ লাভের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এরজন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হবে ভৌগোলিক অবস্থান, গ্রাম ও শহর এলাকার, বিভিন্ন পেশা ও জীবিকার শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যেন শিক্ষার সুযোগ সুবিধা ও ফল লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি হতে না পারে। বিভিন্ন সময়ে গঠিত শিক্ষা কমিশন ও কমিটির রিপোর্টে এবং নীতি নির্ধারণমূলক দলিলে উচ্চ শিক্ষায় ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। আপনাদের জানার জন্য এর কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা;

২. মহিলারা এবং অর্থনৈতিক অসচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা যেন উচ্চ শিক্ষায় আসতে পারে তার পরিকল্পনা করা;

৩. প্রতিভাবান ছাত্রদের অধিকাংশের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে অর্থাভাব। তাদের জন্য ব্যাপক হারে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে;

৪. দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা থাকতে হবে;

৫. কর্তৃপক্ষের সাহায্য, নাগরিকদের দান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের অনুদান নিয়ে প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র কল্যাণ তহবিল গঠন করে অভাবগ্রস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে;

৬. অভাবী ছাত্রদের পর্যাপ্ত অনুদানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান যাতে বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষার্থীরা সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতই শিক্ষার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যার সাথে সঙ্গতি রেখে এবং জাতীয় প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. ভর্তির সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনবোধে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোটা ও অনান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শিক্ষায় নাগরিকদের সমান সুযোগ কোন দলিলে সন্নিবেশিত হয়েছে?
   ক. জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদে
   খ. ইউনেস্কোর নীতিমালায়
   গ. বাংলাদেশ সংবিধানে
   ঘ. ক ও গ উত্তর শুদ্ধ

২. সামাজিক ন্যায়নীতি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
   ক. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে
   খ. পরিবারের সহযোগিতায়
   গ. আন্তর্জাতিক সহযোগিতায়
   ঘ. ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে

৩. উচ্চ শিক্ষায় সরকারি পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ প্রধানত কারা বেশি ভোগ করে?
   ক. দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা
   খ. মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা
   গ. সম্পদশালী পরিবারের সন্তানেরা
   ঘ. সব ধরনের পরিবারের সন্তানেরা

৪. কোন অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কম?
   ক. শহর
   খ. গ্রাম
   গ. বন্দর
   ঘ. হাওর

৫. সমাজে ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত কি?
   ক. সকল মানুষের শিক্ষা গ্রহণে সমান অধিকার
   খ. সকল মানুষের শিক্ষার সুযোগ লাভের অধিকার
   গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ লাভের অধিকার
   ঘ. ক ও খ উত্তর শুদ্ধ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ লাভের অধিকার সম্পর্কে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের বক্তব্য লিখুন।

২. উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণে কি ধরনের বৈষম্য দেখা যায় - উল্লেখ করুন।

৩. উচ্চ শিক্ষায় বৈষম্য সৃষ্টির কারণ কি - ব্যাখ্যা করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. উচ্চ শিক্ষায় ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত- সে সম্পর্কে আপনি একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখুন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। ঘ ২। ক ৩। গ ৪। খ ৫। ঘ।

পাঠ ৪.৩ উচ্চ শিক্ষার উৎকর্ষ ও দক্ষতার সমকালীন অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ উচ্চ শিক্ষার উৎকর্ষ ও দক্ষতা অর্জনের বর্তমান অবস্থান বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ❑ উৎকর্ষ ও দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবেন।

বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কলেজগুলো সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতা এবং প্রতিকূল পরিবেশের মাঝেও শিক্ষাদান কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও কতিপয় অনুষদ এবং স্বল্পসংখ্যক কলেজ শিক্ষার গুণগত মানের দিকে খ্যাতি অর্জন করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের গ্রাজুয়েটদের মান বর্হিবিশ্বেও স্বীকৃত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের সম্প্রসারণের ফলে গুণগত দিক দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানের বিশেষ উন্নতি হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় এখন সার্কভুক্ত দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে শুধু শীর্ষস্থানে নয়; মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস ইত্যাদি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপরেও স্থান করে নিয়েছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক পরিচালিত এক জরিপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে Centre of Excellence হিসাবে উল্লেখ করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০% ভাগ শিক্ষকের পিএইচডি ডিগ্রী আছে এবং ৩০% শতাংশের উচ্চতর ডিগ্রী আছে। ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে স্নাতক সম্মান কোর্সে ভর্তি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আলাদাভাবেই নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করে। মেডিক্যাল কলেজে কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। ডিগ্রী কলেজেও স্নাতক সম্মান কোর্সের জন্য ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য আনয়নের লক্ষ্যে পায়ওনিয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কতিপয় কলেজে স্নাতক সম্মান কোর্স চার বছরের করা হয়েছে। সম্মান ও মাস্টার্স কোর্সের পাঠ্যসূচি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন নতুন অনুষদ ও বিভাগ খোলা হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবদানও স্বীকৃতি লাভ করেছে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য যে সামাজিক চাহিদা রয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তা পূরণ সম্ভব হচ্ছে। শ্রমবাজারের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অধ্যয়নের বিষয় নির্বাচন করে সুযোগ্য শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় চুক্তিভিত্তিতে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ করে থাকে। কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটগণ ইতিমধ্যে ভাল পেশা ও চাকুরীতে প্রবেশ করতে পেরেছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে সামাজিক চাহিদা ও শ্রমবাজারের চাহিদা পরিপূরণে অবদান রাখতে পারবে। এসব কারণে সরকার উদ্যোগক্তাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও স্বল্প ব্যয়ে অনেক ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যসূচি পরিচালনা করছে। এরফলে অংশগ্রহণকারীগণ নিজ নিজ পেশা ও বৃত্তির ক্ষেত্রে লাভবান হচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী কলেজগুলোর একাডেমিক কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান করছে। ১৯৯৮ সনে ৩০টি মূল বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে এবং লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে স্নাতক সম্মান শ্রেণী ভর্তির নিয়ম প্রবর্তন করে। তাছাড়া নতুন শিক্ষকদের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের কার্যসূচিও প্রবর্তন করেছে। এসব ব্যবস্থা ডিগ্রী কলেজের শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

সমাজ উচ্চ শিক্ষা থেকে অনেক কিছু আশা করে। দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরির জন্য অর্থাৎ দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে উৎপাদনমূলক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি- এগুলো উচ্চ শিক্ষার প্রধান কাজ। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সঞ্চারণ কাজে উচ্চ শিক্ষার ভূমিকা রয়েছে। উচ্চ শিক্ষার অবদান ভোগের ক্ষেত্রে সকলে যেন সমান সুযোগ লাভ করতে পারে সমাজ এটাও আশা করে। সমাজের এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা উচ্চ শিক্ষা কতটুকু মিটাতে পারছে তাই প্রকৃতপক্ষে উচ্চ শিক্ষার উৎকর্ষতা।

বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তির অসামঞ্জস্য

অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে শিক্ষার্থী সংখ্যা পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে ১৯৯৯ সালে পাঁচটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থী ও পাঁচটি বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিষয়সমূহে ২৬৯০৭ জন (৪৩.০০ শতাংশ) অধ্যয়নরত ছিল; কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৩৫,৬৭৮ জন (৫৭.০০ শতাংশ)। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, কৃষি ও চিকিৎসার আসন সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। এরফলে এসব বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কম। আবার সামগ্রিক ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় ৭৮.৫০ শতাংশ ছয়টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অবশিষ্ট ২১.৫০ শতাংশ কৃষি, প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে (সারণি-৮ দ্রষ্টব্য)।

পরীক্ষার ফলাফলে অপচয়

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রকারের কোর্সের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে স্নাতক পাস ডিগ্রী ও টেকনিক্যাল স্নাতক পর্যায়ে উত্তীর্ণের হার অন্যান্য ডিগ্রী অপেক্ষা অনেক কম (সারণী-৯ দ্রষ্টব্য)।

সারণি-৮: নয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা, ১৯৯৯

(বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুষদ ভিত্তিক)

বিশ্ববিদ্যালয়	কলা অনুষদ			সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ			বিজ্ঞান অনুষদ			বাণিজ্য অনুষদ			মোট
	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৭৮১	১৬০৬	৪৩৮৭	২০১৫	১৪৪১	৩৪৫৬	৩০২৪	১৩৩৩	৪৩৭৫	২৪৪২	৫৯০	৩০৩২	১৫২৩২
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৪৯৩	৮৪২	৩৩৩৫	১৮৩৪	৬১৪	২৪৪৮	২৬৮৬	৭০১	৩৩৮৭	১৭৪৭	১৬৮	১৯১৫	১০৭৮৫
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়							৪০৪২	৭৬৪	৪৮০৬				৪৮০৬
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়							৬১৯৮	৮৮৬	৭০৮৪				৭০৮৪
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	১৭১১	৯৬৪	২৭৬৫	১৬৩০	৭৮১	২৪১১	২০৯৫	৫০৩	২৫৯৮	২১৮৮	৩৮৯	২৫৭৭	১০৩৫১
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	৯০৭	৫৫৫	১৪৬২	৯৪১	৬০৬	১৫৪৭	৯৮৬	৫১০	১৪৯৬				৪৫০৫
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	১২৩৮	৩০	১২৬৮	২২৬৩	৬৪৯	২৯১২	৪৯১	৫৭	৫৪৮	৮৫৪	৮৭	৯৪১	৫৬৬৯
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়				৮১২	২৭৯	১০৯১	১৪২২	১০৮	১৫৩০	৩৫	২	৩৭	২৫৫৮
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়							৯৩৮	১৬৩	১১০১	১৪৪	৪০	১৮৪	১২৮৫
মোট	**১৩১২৭**			**১৩৮৬৫**			**২৬৯০৭**			**৮৬৮৬**			**৬২৫৮৫**
	২১.১৮%			২২.১৫%			৪২.৯৬%			১৩.৮৮%			১০০.০০

উৎস: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৯ সারণি-১০.৫

সারণি-৯: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিগ্রী প্রাপ্তদের শতকরা হার ১৯৯৯

পরীক্ষা	শতকরা হার
পাস স্নাতক	৩৫.৫৮
সম্মান স্নাতক	৮৫.১২
কারিগরি স্নাতক	৬৭.৯০
স্নাতকোত্তর	৮১.৯৫
কারিগরি স্নাতকোত্তর	৯৮.২২

উৎস: বিমক, বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৯

নয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৯ সনের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিগ্রী প্রাপ্তদের মধ্যে দেখা যায় উত্তীর্ণের হার পাশ স্নাতকে সর্বনিম্ন ৩৫.৫৮ শতাংশ। কারিগরি স্নাতকে উত্তীর্ণের হার পাস স্নাতকের চেয়ে বেশি। তবে, সম্মান স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের চেয়ে পাশের হার অনেক নিচে।

সাধারণভাবে ডিগ্রী কলেজগুলোর পাশ স্নাতক পর্যায়ে উত্তীর্ণের হার বিভিন্ন বর্ষে ৪৫ শতাংশের মধ্যে বিস্তৃত থাকে। ১৯৯৯ সালে স্নাতক পাশের বিভিন্ন কোর্সে গড়ে উত্তীর্ণের হার ছিল ৪৪.৩৯ শতাংশ। এই উত্তীর্ণদের অধিকাংশই কলা শাখার।

দুর্বলতা ও সমস্যা

উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তদের মধ্যে বেকারত্ব একটি বড় সমস্যা। কলা শাখার গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে বেকারত্বের হার বেশি। মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বি আই টি, কৃষি কলেজ ও টিচার ট্রেনিং কলেজ ছাড়া উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে অনেককে চাকুরীর জন্য বেশ কিছুকাল সময় অপেক্ষা করতে হয়। অনেকে বেশ কয় বছর বেকার থাকে। উচ্চ শিক্ষায় দুর্বলতা বা চাকুরীর সুযোগ কমের জন্য বেকারত্ব দেখা যায়।

বেকারত্ব

বিষয় ও বিষয়বস্তুর সাথে কর্ম ও পেশার সম্পর্কের অভাব

অপরদিকে চাকুরী দাতাগণ মনে করেন প্রার্থীগণ যে সব বিষয় ও বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করেছেন তা নতুন কর্ম ও পেশার জন্য পর্যাপ্ত নয়। এসব কর্মের চাহিদার জন্য প্রার্থীদের আরো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে এমন কোন বিষয় পড়ানো হয় যা বাংলাদেশের চাহিদা ও সম্পদের অপচয় বিবেচনায় বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন। অনেক বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরিমার্জন ও নবায়ন করা হয়নি। সমকালীন প্রয়োজনে যে সব বিষয়ে আধুনিকীরণ করা একান্ত অপরিহার্য সেগুলোও অনেক পিছিয়ে আছে। বহির্বিশ্বের উন্নত দেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার জ্ঞানচর্চার সাথে যোগাযোগের অভাবে মূলত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে।

গবেষণার সীমিত সুযোগ

মৌলিক গবেষণা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা অনুসারে পরিচালিত গবেষণার পরিসর সীমিত। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বাজেটে গবেষণার জন্য বরাদ্দ অপ্রতুল। মঞ্জুরী কমিশন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একাডেমিক স্টাফ ও গবেষণা সাপোর্ট ফান্ড থেকে যে গবেষণা মঞ্জুরী দেওয়া হয় সেগুলোও পর্যাপ্ত নয়।

দেশের নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের গবেষণার ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পি এইচ ডি ও অন্যান্য গবেষণা কর্মে নিয়োজিত সংখ্যা একেবারে কম। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্র ছাত্রীদের ০.২ শতাংশের কম গবেষণায় নিয়োজিত থাকে।

শিক্ষার মান অর্জনে প্রতিবন্ধকতা

উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান সম্পর্কেও সমালোচনা দেখা যায়। এসব প্রতিষ্ঠানের শিখন-শিক্ষণের মান আশানুরূপ নয়। উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষকদের যোগাযোগের অভাব, অধুনা প্রকাশিত বই পত্রিকা, জার্নালের সরবরাহের অভাব, ইন্টারনেট, গবেষণাগারের সরঞ্জাম ও উপকরণের অভাবের ফলে শিক্ষাদানের মান ব্যাহত হচ্ছে।

এখানে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গুণগত মানের অবনতি সম্পর্কে মঞ্জুরী কমিশনের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। অতীতে সযত্নে ও সতর্কতা অবলম্বন করে শিক্ষক নিয়োগ হতো। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক জ্ঞানীগুণী শিক্ষক নিয়োজিত হতেন।

বর্তমানে নিয়োগের ন্যূনতম যোগ্যতা সম্পর্কে নীতিমালা নির্ধারণ করে দেওয়া হলেও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তা পালন করছে না, ফলে শিক্ষকদের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা নেই। গবেষণার ক্ষেত্রেও শিক্ষকদের অবহেলা দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্ব স্ব ছাত্রদের মধ্য থেকে শিক্ষক নিয়োগের ঝোঁক বেশি। এতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চিরায়িত ঐতিহ্য ক্ষুণ্ন ও প্রকৃত মেধার আকর্ষণ ও লালন ব্যাহত হচ্ছে। ফলে ছাত্র শিক্ষক উভয়ের মান, জ্ঞান ও মর্যাদা নিম্নগামী হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে আমাদের অবিলম্বে মুক্তি লাভ করা একান্ত প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মানের অবনতির কারণগুলো অনেকাংশে কলেজের জন্যও প্রযোজ্য। অনেক ডিগ্রী কলেজে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর মাষ্টার্স কার্যক্রম খোলা হয়েছে অত্যাবশ্যকীয় প্রস্তুতি ছাড়াই। সুসজ্জিত গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার অনেক কলেজে নেই। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ কাজও বিলম্বিত হয়। যার ফলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ছাড়াই অনেক ক্ষেত্রে কলেজগুলোকে একাডেমিক কার্যক্রম চালাতে হয়। পুনরায় কলেজের শিক্ষকদের পেশা উন্নয়নের জন্য দেশের বাইরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ খুবই কম। কাজেই বিষয়ের নতুন জ্ঞান, নতুন শিক্ষা সরঞ্জাম ও শিক্ষা পদ্ধতির সাথে শিক্ষকদের পরিচিতি হওয়া বা শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ লাভ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ নাই বললেই চলে।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক একাডেমিক কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। মঞ্জুরী কমিশন এই পরিবেশ সম্পর্কে পর্যালোচনা করে বলেছেন যে জাতীয় রাজনৈতিক দলসমূহের সহযোগী সংগঠন হিসাবে ছাত্র রাজনীতির কারণে অস্বাভাবিক নন-একাডেমিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার ফলে ছাত্রছাত্রীদের জীবনের মূল্যবান কয়েকটি বছর হারিয়ে যাচ্ছে ও তারা হতাশাগ্রস্ত হচ্ছে। তদুপরি শিক্ষকদের নিজ দায়িত্ব, ক্লাস নেওয়া, সময়মত পরীক্ষা নেওয়া ও উত্তরপত্র দেখা ইত্যাদির প্রতি উদাসীনতার কারণে সেশন জট উত্তরণ সম্ভব হচ্ছে না। অধুনা কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছে। তবুও বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট ও নন একাডেমিক পরিবেশের কারণে শিক্ষাদান কাজ ব্যহত হচ্ছে।

পরিশেষে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান সম্পর্কে বলা যায় যে এই প্রতিষ্ঠানগুলো খন্ডকালীন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং বেশিরভাগই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়ে একাডেমিক কার্য পরিচালনা করছে। এতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষাদান কাজ ব্যহত হচ্ছে; অপরদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না। মঞ্জুরী কমিশন এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কার্যকারিতা ও উৎকর্ষের দুর্বলতা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নয়ন ও আবর্তক ব্যয় বেড়ে চলেছে। বর্তমানে একজন শিক্ষার্থীর জন্য বার্ষিক আবর্তক ব্যয় প্রায় ৩৫,০০০ টাকা, অথচ বেতন ও অন্যান্য ফি বাবদ গড়ে মাথাপিছু আয় হয় মাত্র ৫০০ টাকা। এ ধরনের অযৌক্তিক ব্যয়ের ফলে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিরাই বেশি লাভবান হয়ে থাকে। এটা লক্ষ্য রাখা উচিত যে, বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পদ্ধতি উচ্চ শিক্ষাকে দক্ষভাবে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলতে পারে নি। পদ্ধতির অনমনীয়তা, কর্মক্ষেত্রের চাহিদার সাথে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী সংখ্যার সমন্বয়ের অভাব, কোর্স পরিকল্পনার অসমতা, গবেষণা সুযোগের অপ্রতুলতা, ব্যাপক ছাত্র অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা এবং প্রাপ্ত সম্পদের অপচয় ইত্যাদি কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শিক্ষার গুণগত মানের দিক দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান কোন দেশের উপরে?
   ক. যুক্তরাষ্ট্রের ও ভারতের
   খ. যুক্তরাজ্যের ও শ্রীলংকার
   গ. সার্কভুক্ত দেশের
   ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

২. Centre of Excellence হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য কি?
   ক. ৪০% ভাগ শিক্ষকের পি এইচ ডি ডিগ্রী আছে
   খ. মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়
   গ. শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন বিষয় খোলা হয়েছে
   ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

৩. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের কোন প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে?
   ক. উচ্চ শিক্ষার জন্য সামাজিক চাহিদা
   খ. উচ্চ শিক্ষার সার্বজনীন চাহিদা
   গ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাহিদা
   ঘ. সমকালীন বিশ্বায়নের চাহিদা

৪. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কোন বিষয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা সর্বাধিক?
   ক. বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কলা
   খ. কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও বাণিজ্য
   গ. কলা, বিজ্ঞান ও কৃষি
   ঘ. চিকিৎসা, সামাজিক বিজ্ঞান, প্রকৌশল

৫. কোন পরীক্ষার উত্তীর্ণের হার সর্বনিম্ন?
   ক. মাস্টার্স
   খ. স্নাতক অনার্স
   গ. পাস স্নাতক
   ঘ. কারিগরি স্নাতক

৬. স্নাতকোত্তর পর্যায়ের গবেষণায় নিয়োজিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত?
   ক. ১.০০ শতাংশের কম
   খ. ০.২০ শতাংশের কম
   গ. ১.২০ শতাংশের কম
   ঘ. ২.০০ শতাংশের কম

৭. কলেজগুলোর শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের অন্তরায় কি?
   ক. শিক্ষকদের উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ খুবই কম
   খ. নতুন শিক্ষা সরঞ্জামের অভাব
   গ. একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব
   ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উৎকর্ষের ক্ষেত্রে দুর্বলতা সম্পর্কে কি বলা হয়েছে - বর্ণনা করুন।

২. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গুণগতমান সম্পর্কে মঞ্জুরী কমিশন কি বলেছে - উল্লেখ করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উৎকর্ষ ও দক্ষতা অর্জনের বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে লিখুন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১।গ ২।ঘ ৩।ক ৪।খ ৫।গ ৬।খ ৭।ঘ।

পাঠ ৪.৪

উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়ন, উৎকর্ষ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত নীতি ও কর্মপন্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়ন, উৎকর্ষতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- ❑ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ তে উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়ন ও উৎকর্ষতার বিষয়ে গৃহীত নীতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়ন, উৎকর্ষ সাধন করে এই স্তরের শিক্ষা যেন জাতীয় উন্নয়নে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারে এবং শিক্ষার মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপনীত করতে পারে সেজন্য সকল মহলের সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। এ কারণে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ এ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে।

পঞ্চম পরিকল্পনার গৃহীত নীতি, কৌশল ও কার্যক্রম

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্যসমূহের প্রাসঙ্গিক কয়েকটি নিচে দেওয়া হলো:

১. উচ্চ শিক্ষার উৎকর্ষ, নির্বাচন ও মানের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া;

২. বিভিন্ন বিভাগে ছাত্র ভর্তির যৌক্তিককরণ;

৩. উচ্চ শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দেশের বাইরে আরো প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি;

৪. পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি সময় উপযোগী ও আধুনিকীকরণ;

৫. আধুনিক গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার স্থাপন;

৬. শিক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং

৭. বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সহযোগিতা কার্যক্রমের প্রসার।

এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে উৎকর্ষ বিকাশের কেন্দ্র (centre of excellence) হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মান উন্নয়নের জন্য বিদেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা নিয়মিত মূল্যায়ন করা হবে। কর্মদক্ষতা ও স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশনার উপর ভিত্তি করে শিক্ষকদের পদোন্নতি দেওয়া হবে।

গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামসহ আধুনিক গবেষণাগার গড়ে তোলা হবে এবং গ্রন্থাগারে সদ্য প্রকাশিত জার্নাল/গ্রন্থ সরবরাহ করা হবে।

ডিগ্রী কলেজের চাহিদা পূরণের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে শক্তিশালী করা হবে। কলেজ শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গ্রন্থাগার ও গবেষণাগারের সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কলেজ শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন করা হবে। কয়েকটি কলেজকে উৎকর্ষ বিকাশের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হবে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পদ কেন্দ্র এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে আরো শক্তিশালী করা হবে।

যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাদান ও গবেষণার উপর গুরুত্ব দিয়েছে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়কে উৎসাহ প্রদান করা হবে। শিক্ষার মান ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য সরকারি নীতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনুসরণ করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ সমকালীন উচ্চ শিক্ষাকে যুগোপযুগী করা ও দেশের প্রয়োজন মিটানোর লক্ষ্যে পূনর্বিন্যাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। উচ্চ শিক্ষার মান, উৎকর্ষতা ও দক্ষতার উন্নয়নের জন্য কতকগুলো নীতি গ্রহণ করেছে এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট নীতিগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. উচ্চ শিক্ষা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের করা হবে।

২. উচ্চ শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা হবে।

৩. প্রকৌশল, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, বস্ত্র ও চামড়া ইত্যাদি বিষয়সমূহ শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৪. দেশের উচ্চ শিক্ষার স্বার্থে অনুমোদিত ও প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এবং শিক্ষকদের যোগ্যতা ইত্যাদি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের অনুরূপ হবে।

৫. বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও শিক্ষার মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপরে মঞ্জুরী কমিশনের নিয়ন্ত্রণ তেমন কার্যকর নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন শিক্ষানীতিতে মঞ্জুরী কমিশনকে শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে। মঞ্জুরী কমিশন এ দেশের উচ্চ শিক্ষায় সমন্বয় সাধন ও নেতৃত্ব প্রদান করবে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার মান যাতে মর্যাদাপূর্ণ হয় সেই লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন এবং সেগুলোর বাস্তবায়নের জন্য কমিশন দায়িত্ব পালন করবে। উচ্চ শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইন ও মঞ্জুরী কমিশনের আইনের অসঙ্গতি চিহ্নিত করে তা দূর করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. নিচের কোনটি উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বহির্ভূত?
   ক. শিক্ষক নিয়োগ
   খ. আধুনিক গবেষণাগার স্থাপন
   গ. পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ
   ঘ. ছাত্র ভর্তির যৌক্তিকরণ

২. শিক্ষকদের পদোন্নতির জন্য পঞ্চম পরিকল্পনা অনুযায়ী কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে?
   ক. কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন
   খ. স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশনা
   গ. শিক্ষকতার কার্যকাল বিবেচনা
   ঘ. ক ও খ উত্তর শুদ্ধ

৩. ডিগ্রী কলেজের উন্নয়নের জন্য পঞ্চম পরিকল্পনায় কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?
   ক. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ
   খ. গ্রন্থাগার সমৃদ্ধকরণ
   গ. গবেষণার সুসজ্জিত করা
   ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জাতীয় শিক্ষানীতিতে উচ্চ শিক্ষার উৎকর্ষ ও মান উন্নয়নের জন্য কি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে - উল্লেখ করুন।

২. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য মঞ্জুরী কমিশন কি ভূমিকা পালন করবে - বর্ণনা করুন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ।